এমনটি হবার কথা ছিলো না

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

এসপিএন-স্টার স্পোর্টসের জনপ্রিয় প্রোগ্রাম স্পোর্টসলাইন-স্পোর্টস সেন্টার। খেলাধুলার সংবাদভিত্তিক এই প্রোগ্রামটি সেদিনও এগোচ্ছিল স্বাভাবিক গতিতে। পৃথিবীর নানা প্রান্তের বহু রকম খেলার খবরের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করছিল শ্রোতা-দর্শকের তথ্যভান্ডার। অনুষ্ঠান শেষ হবার ঠিক আগে আগে প্রেজেন্টার যে ঘোষণা দিলেন তার বঙ্গানুবাদ অনেকটা এ রকম- 'এই ছিল আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। আসুন, আমরা সবাই ভারত-বাংলাদেশ টেস্টের এ অংশটুকু দেখে হাসতে হাসতে আজকের মতো বিদায় নিই।' এই বলে ঢাকা টেস্টের তৃতীয় দিন সকালে শচীন টেন্ডুলকারকে রানআউট করার যে সহজ সুযোগ মিস্ করেছিল খালেদ মাসুদ পাইলট, সেটির ভিডিও ক্লিপিং দেখাচ্ছিলো। আর হো হো করে হাসছিল প্রেজেন্টার। সঙ্গে নিশ্চয়ই হাসছিলো অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটবোদ্ধা-কর্মকর্তা-দর্শকরা। নিতান্তই পাড়াতো ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ আছে বলে হয়তো হো হো করে হাসেনি ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কাবাসী। কিন্তু ঠোঁটের কোণে টিপ্পনির বাঁকা হাসি তো নিশ্চিতভাবেই ছিলো।

হাসতে পারিনি কেবল আমরা, বাঙালিরা। লজ্জায়-অপমানে নীল হয়ে টিভি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না আমাদের।

অথচ এমনটা হবার কথা ছিল না। টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার ৪ বছর পরও বাংলাদেশ হাসি-ঠাট্টার পাত্র রয়ে যাবে এমনটা তখন ভাবা যায়নি। এটা আমাদের, অর্থাৎ সাধারণ দর্শককুলের প্রাপ্য নয়। তবুও কেন বারবার এমন অপমান সহ্য করতে হয়? এর জন্য দায়ী কারা?

প্রধানত দায়টা বর্তাবে তৎকালীন ক্রিকেট কর্মকর্তাদের ওপর। যারা টেস্ট পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। আর জগমোহন ডালমিয়া, যিনি মরিয়া ছিলেন বাংলাদেশের ভোটের জন্য। যে ভোট তার আইসিসি প্রেসিডেন্ট হবার পথ তৈরি করবে। করেছেও। বিনিময়ে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ হয়েছে টেস্ট স্ট্যাটাস। সঙ্গে বোনাস হিসেবে ক্রিকেট বিশ্বজুড়ে কাঁড়ি কাঁড়ি অপমান।

মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়েই একটি শিশু দৌড়াতে পারে না। তাকে প্রথমে হামাগুঁড়ি দেয়া শিখতে হয়। এরপর হাঁটা, তারপর দৌড়। গত শতকের আশির দশক থেকে ক্রিকেট নামক খেলায় হামাগুঁড়ি দেবার মাধ্যমে আমরা যে যাত্রা শুরু করি, শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সেটা সবেমাত্র হাঁটা শুরু করেছিল। জিতেছিলাম আইসিসি, সেই সঙ্গে বিশ্বকাপে গোটা দুয়েক ম্যাচ। তখন তৈরি হচ্ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেটের চমৎকার এক ভিত্তি। অথচ আমরা ভিত্তি মজবুত করার দিকে নজর দিলাম না। একতলা ফাউন্ডেশনের ওপর গড়ে তুললাম ২৪ তলা বিল্ডিং। সামান্য ভূমিকম্পে সে বিল্ডিং তো ধসে পড়বেই। টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়া তো আর সামান্য ভূমিকম্পের মতো ব্যাপার নয়। বরং রিখটার স্কেলে এর মাত্র ৮-১০-এর মতো। ফলাফল অনিবার্য। ৩৪ টেস্টে ৩১ পরাজয়।

বাংলাদেশ মানেই যেন ক্রিকেট বিশ্বে উপহাসের পাত্র। ভারত যে আমাদের দু'টেস্টেই ইনিংস ব্যবধানে হারালো, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। শচীন, রাহুল, সৌরভ, গম্ভীররা যে রানের বন্যা বইয়ে দিল সেটাই তো স্বাভাবিক। চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম দিন শেষে রাহুলের রান ১৪৫। অথচ হার্শা ভোগলে, রবি শাস্ত্রীরা কমেন্ট্রিতে আলাপ করছেন বীরেন্দর শেওয়াগের ৩০৯ রানে রেকর্ড না ভেঙে ফেলেন তিনি। শচীন অপরাজিত ৩৬ রানে। অথচ তারা বলছেন লিটল মাস্টারের ৩৫তম সেঞ্চুরির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে। যেন রাহুল ও শচীন চাইলেই বাকি ১৬৫ ও ৬৪ রান করতে পারেন। হয়তো পারতেনও। মাশরাফি নামক এক 'গোবরে পদ্মফুল'-এর জন্য সেটা হয়নি। কিন্তু হার্শা ভোগলে, রবি শাস্ত্রীর এই অবহেলাভরা কথা সহ্য করা মুশকিল।

সহ্য আমাদের করতেই হবে। কেননা, কিছু তো করার নেই। যাদের করার, তারা কিছু করেননি। টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার পর যতোটা পরিকল্পনামাফিক এগোনোর কথা ছিল বাংলাদেশের, তার ছিটেফোঁটাও হয়নি। বারবার বিদেশী কোচ এসেছে। তাদের কথায় কিছুদিন সবাই নেচেছে। ক্রিকেট বোর্ড থেকে শুরু করে খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, মিডিয়া সবাই। সেই কিছুদিনের 'হানিমুন পিরিয়ড' শেষ হলে সবাই মিলে কোচের গুষ্ঠী উদ্ধার। এভাবে তো একটা দেশের ক্রিকেট এগিয়ে যেতে পারে না। বিদেশী কোচ আনার ক্ষেত্রে কোন মানদন্ড

ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে যার হাত ধরে ('৯৭-এর আইসিসি শিরোপা ও '৯৯-এর বিশ্বকাপে দুটি জয়) সেই গর্ডন গ্রিনিজকে আমরা এক প্রকার তাড়িয়ে দিয়েছি। এরপর অনেক কোচ এসেছে কিন্তু গ্রিনিজকে ছাড়ানো তো দূরে থাক, তার সমপরিমাণ সাফল্যও কেউ এনে দিতে পারেনি। তবে বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক হলো দক্ষিণ আফ্রিকান কোচ এডি বারলোর অসুস্থতা। এ দেশের ক্রিকেট নিয়ে তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সেটি কাজে লাগাতে পারলে এতো দিনে হয়তো টেস্ট আঙ্গিনায় সমীহ করা দলে পরিণত হতে পারতো বাংলাদেশ। দুর্ভাগ্য সেটি হয়নি। কিন্তু ট্রেভর চ্যাপেল, মহসিন কামালদের হাতে কোন যোগ্যতায় ক্রিকেট দল ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, সে প্রশ্নের জবাব আজো কেউ দেয়নি। এ দুই কোচের অধীনে সামনে না এগিয়ে বরং আরো পিছিয়ে গেছে এ দেশের ক্রিকেট।

ডেভ হোয়াটমোরের যোগ্যতা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। দায়িত্ব পাবার পরপরই অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান সফরে তিনি তার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন। সে ধারা অব্যাহত ছিল জিম্বাবুয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও। কিন্তু এরপর আবারও উল্টো পথে হাঁটা। সবার জন্য উল্টো হলেও আমাদের জন্য সেটাই যেন সোজা পথ। নইলে কেন এ রকম পরাজয়ে পরাজয়ে জর্জরিত হবো আমরা?

আসলে হোয়াটমোরের এরচেয়ে খুব বেশি কিছু করার নেই। কেননা, জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের সেই কোয়ালিটিই নেই। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন- 'কেন, কোয়ালিটি থাকবে না কেন? অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান সফরে টাইগাররা (!) ভালো খেলেনি? সেরকম খেলতে পারলেই তো হয়।' তাদের উদ্দেশে বলা- আমাদের কোয়ালিটিই হচ্ছে এরকমই- হঠাৎ হঠাৎ ভালো খেলা। ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলার যোগ্যতা বর্তমান জাতীয় দলের খেলেয়াড়দের নেই। সেটা তৈরি করে নিতে হবে। শুরু করতে হবে অনূর্ধ্ব-৮, অনূর্ধ্ব-১০ বয়সীদের নিয়ে। তখন ওদের যেভাবে খুশি ওদের তৈরি করা যাবে। স্ট্যান্স ঠিক করা যাবে, রানআপ ঠিক করা যাবে, বোলিং-ব্যাটিং স্টাইল শুদ্ধ ও কার্যকর করা যাবে। জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের তো আর সেটা হবে না। এঁটেল মাটি তো তখন শক্ত হয়ে যায়। এই দিকটিতে অর্থাৎ অনূর্ধ্ব দলগুলো নিয়ে কাজ করার দিকে কারো নজর আছে বলে মনে হয় না।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান বলেছিলেন, 'নাফিস-আশরাফুল-আফতাবদের বয়সে আমি ওদের মতো ভালো খেলা খেলতাম না। বস্তুত, ওটা ছিল নিজেকে তৈরি করার বয়স। জাতীয় দলে যদি ওরা আরো ২-৩ বছর পর আসতো, তাহলে দল এবং ওদের নিজেদের জন্যও সেটা অনেক ভালো হতো।' আসলেই তাই। দু-এক মৌসুম খেলেই আজকাল যে কেউ জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। প্রতিভার দীপ্তি দেখলেই নির্বাচকরা তাদের দলে টানছেন। এটা ওসব খেলোয়াড়ের জন্যও হিতে বিপরীত হচ্ছে। অলক কাপালির উদাহরণ তো হাতের কাছেই। আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। ভারতের বিপক্ষে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে অভিষেক হয় পেসার নাজমুল হোসেনের। বিস্ময়করভাবে সেটাই নাজমুলের কেরিয়ারের প্রথম ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ। যা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং সুনীল গাভাস্কারও। মেধাবী তরুণদের এভাবে শুরুতেই জ্বলন্ত উনুনে ঠেলে দেয়ার অধিকার নির্বাচকদের আছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা উচিত।

নাজমুল-অলকরা যে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে নিজেদের তৈরি করবেন, সেই ঘরোয়া ক্রিকেটটা হচ্ছে কোথায়? গত বছর তো কোনো লীগই হয়নি। টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়া একটি দেশের ক্রিকেট বোর্ডের জন্য এটা যে কতো বড় ব্যর্থতা সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য বর্তমান ক্রিকেট বোর্ডও সেটা থোরাই কেয়ার করে। বোর্ডে যতো না ক্রিকেট কর্মকর্তা রয়েছেন তার চেয়ে বেশি আছেন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। এরা হয়তো তাদের দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেই যোগ্যতা তো থাকতে হবে। আর এটা তো এমন ব্যাপার না যে ঠকতে ঠকতে শিখলাম। এখানে দেশের মানসম্মানের ব্যাপার জড়িত। ১০ জন উপদেষ্টার মাধ্যমে যেভাবে বোর্ড চালাচ্ছেন সভাপতি আলী আজগর লবি, তাতে আর যাই হোক, এ দেশের ক্রিকেটের পথচলা কখনো সম্মুখমুখী হবে না।

একজন ক্রিকেটারের বেড়ে ওঠার আদর্শ ক্ষেত্র ঘরোয়া আসর। ঘরোয়া লীগের কাঠামো শক্তিশালী হলে এর প্রতিফলন জাতীয় দলে পড়ে। শেফিল্ড শিল্ডের উন্নতমানই বর্তমান অসি দলের উন্নতির মূল্য রহস্য বলে বিবেচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এতো বেশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমুখী হয়েছে যে, ঘরোয়া ক্রিকেট আয়োজনের কথা তারা ভুলেই যান। তারা ভুলে যান একজন ক্রিকেটার ৫০ হাজার দর্শকের সামনে আবাহনী-মোহামেডানের স্নায়ু টানটান করা ম্যাচ না খেললে জাতীয় দলে খেলার প্রেসার সামলাতে পারবেন না। ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনা বর্তমানকেন্দ্রিক, সুদূরপ্রসারী নয়। তারা যতো না ক্রিকেট বোঝে, তার চেয়ে বেশি বোঝে বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক ম্যাচ মানেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার স্পন্সরশিপ। ঘরোয়া ক্রিকেটে তো উল্টো টাকা খরচ করতে হবে। তাই ঘরোয়া ক্রিকেট বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পেছনে ছুটছে বিসিবি। কিন্তু এটা যে অচিরেই বুমেরাং হবে, সেটাও তারা বুঝতে পারছেন না। এভাবে যদি আমাদের ইনিংস পরাজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে সেদিন খুব দূরে নয়, যখন ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচ দেখতে হাজারখানেক দর্শকও মাঠে যাবে না।

তবে আশার কথা, এবারের ঘরোয়া ক্রিকেট মৌসুম শুরু হয়েছে। আর নিরাশাজনক হলো, সেটা শুরু হয়েছে টুয়েন্টি টুয়েন্টি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। যখন আমাদের প্রয়োজন বেশি বেশি ৩ দিন, ৪ দিনের ম্যাচ খেলা তখন আমরা খেলছি ২০ ওভারের ম্যাচ। যেন ক্রিজে টিকে থাকার কৌশল ব্যাটসম্যানরা রপ্ত করেছে; এখন বাউন্ডারি হাঁকানো শেখা দরকার। অথচ এখনো আমরা টেস্ট তো দূরে থাক, ওয়ানডে ম্যাচেও নিয়মিত ৫০ ওভার ব্যাটিং করতে পারি না। ইংল্যান্ডে চালু করেছে দেখে আমাদেরও করতে হবে, এটা কোনো কথা হলো? ইংল্যান্ডে কাউন্টিতে তো ৪ দিনের ম্যাচ নিয়মিত হচ্ছে। পাশাপাশি দর্শক আকর্ষণের জন্য টুয়েন্টি টুয়েন্টি উদ্ভাবন। অর্থাৎ খেলোয়াড়দের উৎকর্ষতার জন্য ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ আর দর্শক আকর্ষণের জন্য টুয়েন্টি টুয়েন্টি। আমাদের তো দর্শকের আকাল নেই, অভাব আছে খেলোয়াড়ি উৎকর্ষতার। সে জন্য ২০-২০ নয়, প্রয়োজন বেশি বেশি ৩ দিন, ৪ দিনের ম্যাচ। এই সহজ সাধারণ তথ্যটাও যদি বিসিবি বুঝতে না পারে...

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে। ৩ বছর পর আশরাফুলের সেঞ্চুরি এবং বছরখানেক পর সেই একই স্ফুলিঙ্গ নিয়ে মাশরাফি বিন মোর্তোজার ফেরা ছাড়া আমাদের আর কোনো অর্জন নেই। ৩টি ওয়ানডে ঘিরেও খুব বেশি আশা নেই। তবে আশাভরা চোখে চেয়ে থাকবো জিম্বাবুয়ের বিপক্ষের সিরিজের দিকে। ভারত যাবার পরপরই বাংলাদেশ সফরে আসছে জিম্বাবুইয়ানরা। সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ঝামেলার কারণে হিথ স্ট্রিকের নেতৃত্বে সিংহভাগ খেলোয়াড় দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। টাটেন্ডা টাইবু তারুণ্যনির্ভর যে দলটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, গত অর্ধবছর সে দল কোনো টেস্ট ম্যাচ খেলেনি। অভিজ্ঞতা, খেলোয়াড়ি সামর্থ্য সব দিক থেকেই এই জিম্বাবুয়ে দল বাংলাদেশ থেকে অনেক পিছিয়ে। এই দলটির বিপক্ষে যদি স্বদেশে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ জিততে না পারে, তাহলে এরচেয়ে দুঃখজনক, লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না। বার বার অপমানিত হয়ে আমরা এখন শুধু হতাশ নই, বিক্ষুব্ধও বটে। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে যদি নিজেদের মাটিতে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ জিততে না পারি তাহলে সাদা চামড়ার সাহেবদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে বাধ্য হবো- টেস্ট ক্রিকেটাঙ্গন থেকে বাংলাদেশের নির্বাসন চাই।